রোহিঙ্গারা কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে আরও জানতে চায়

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৪৮ × বুধবার, ২৭ জানুয়ারী ২০২১

রোহিঙ্গা কমিউনিটির সদ্যসরা, বিশেষত ক্যাম্প ১৪ এর বাসিন্দারা আর্থিক সংকটের মুখে পড়ছেন

২০২০ এর মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে কমিউনিটির সদস্যরা মূলত বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় ও ব্যক্তিগত তথ্য নথিভুক্তকরণ, শেল্টার বা শেল্টার সামগ্রী, খাদ্য ও খাদ্য ব্যতিত অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী এবং সাইট উন্নয়নের মতো প্রয়োজনীয়তাগুলোর কথা উঠে এসেছিল। তবে জুলাই মাস থেকে আর্থিক বিষয়, বিশেষ করে নগদ অর্থ আয়ের উপায় নিয়ে কমিউনিটির উদ্বেগ বাড়তে থাকে। যেখানে জুলাই থেকে অক্টোবর মাসে কমিউনিটি থেকে প্রাপ্ত মতামতের শতকরা ৮ ভাগ ছিল নগদ অর্থ আয়ের উপায় ও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত; সেখানে এর আগের চার মাস, অর্থাৎ মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত এ ধরনের মতামত ছিল শতকরা মাত্র ১ ভাগ।

সূত্র: ২০২০ এর মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে কেয়ার বাংলাদেশ, ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি), সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল এবং ইউএনএইচসিআর মোট ৩৪টি ক্যাম্প থেকে কমিউনিটির এই মতামতগুলো সংগ্রহ করেছে (বেস: ৩৩,৬৯৫, যেখানে পুরুষ ৬০% এবং নারী ৪০%)। কমিউনিটি মতামত থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, রোহিঙ্গা কমিউনিটির সদস্যরা, বিশেষত ক্যাম্প ১৪ তে বসবাসকারীদের আর্থিক এবং কাজের সাথে সম্পর্কিত উদ্বেগ বেড়েছে। এই উদ্বেগগুলো সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ক্যাম্প ১৪-তে ২০২০ সালের ৩০ নভেম্বর এবং ২০ ডিসেম্বর মোট ১০ জনের টেলিফোন সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচ জন নারী (২০-৬০ বছর বয়সী) এবং পাঁচজন পুরুষ (২৫-৬৩ বছর বয়সী)। অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগ পুরুষপ্রধান পরিবারের হলেও কিছু নারী বা শিশুপ্রধান পরিবারের অংশগ্রহণকারীও ছিলেন। সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া সদস্যদের মধ্যে একটি পরিবার ব্যতীত অন্য সব পরিবারেই উপার্জনকারী মূলত পুরুষ। এই একটি পরিবার তাদের এক নাতির অনাথ আশ্রম থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তায় চলে।

ক্যাম্প ১৪'র প্রেক্ষাপটে যদি বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় তাহলে দেখা যায়, এখানে জুলাই থেকে অক্টোবর মাসে শতকরা ২৬ ভাগ মানুষ আর্থিক বা নগদ অর্থ আয়ের বিষয়টিকে প্রধান উদ্বেগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ এর আগের চার মাস অর্থাৎ মার্চ থেকে জুন মাসে এ ধরনের উদ্বেগের হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ।

এ বিষয়টি নিয়ে আমরা ক্যাম্প ১৪'র বসবাসকারীদের কাছ থেকে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। এর মধ্যে যারা এই রিপোর্টটির জন্য সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন তারা জানিয়েছেন, মহামারীর কারণে চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ ও নানা ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থার কারণে কাজ খুঁজে পাওয়াটা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। এমনকি এদের কারও কারও ক্ষেত্রে নগদ আয় পুরোপুরি বন্ধও হয়ে গিয়েছিল।

(দ্রষ্টব্য: *খাদ্য ও আশ্রয় (শেল্টার) এর মতো মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে ত্রাণ দেওয়া হয়। তবে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে কাজের অনুমতি তাদের নেই। এদিকে কমিউনিটির সদস্যরা মনে করেন, পড়াশোনা ও চিকিৎসার মতো কিছু খরচ যোগান দেওয়ার জন্য তাদের আয়ের একটি উৎস প্রয়োজন। এছাড়া প্রতি মাসে অতিরিক্ত খরচের খাতে কাপড় কেনা, চা, পান বা নাস্তা খাওয়া এবং কসমেটিক্স কেনার মতো খরচগুলোও তারা যোগ করেন।*)

> "করোনাভাইরাস আসার পর থেকে আমাদের জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে। আমি চাকরি হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছি এবং এখন আমার কিছুই করার নেই।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, কর্মহীন, বয়স ২৭, ক্যাম্প ১৪

খরচের বোঝা/আর্থিক সংকট বাড়া নিয়ে রোহিঙ্গা কমিউনিটির উদ্বেগ

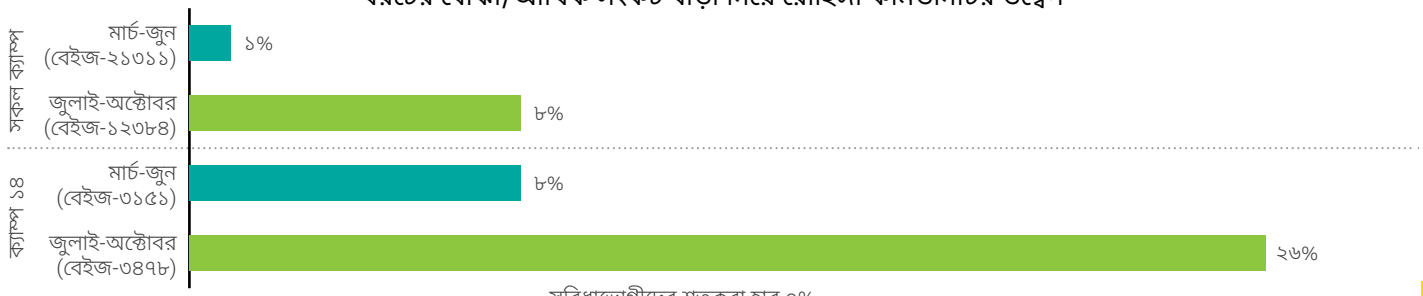

কাজের সীমিত সুযোগ

ভলান্টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবী) এবং মসজিদের ইমামরা (ইসলামিক নেতা) তাদের কাজ ধরে রাখতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে যারা দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, কুলি বা দর্জির মতো নানা ধরনের অনানুষ্ঠানিক বা অস্থায়ী কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের অথবা তাদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে এদের অনেকেই বর্তমানে কাজ হারিয়েছেন। এছাড়া সামগ্রিকভাবে কাজের সুযোগ কমেছে এবং এই কাজগুলোর মধ্যে হোস্ট কমিউনিটির মধ্যকার কাজ, যেমন: চাষাবাদ ও মৌসুমি ফসল কাটা, দিনমজুর, কুলি বা সুপারি সংগ্রহের মতো কাজগুলোও রয়েছে। একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তিনি তার সন্তানদের প্রাইভেট টিউশনের ফি বা খরচও কমিয়ে এনেছেন। তার মতে, গৃহশিক্ষকও এ প্রস্তাবে (কম টাকায় পড়ানো) রাজি হয়েছেন, কেননা শিক্ষার্থী কমে যাওয়ায় তিনিও পড়িয়ে আর আগের মতো আয় করতে পারছেন না।

> “আমার স্বামী হোস্ট কমিউনিটিতে একজন দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু এখন তিনি কোনো কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না। আবার কোনোভাবে কিছু কাজ পাওয়া গেলেও সেখানে মজুরি খুব কম। এর কারণ এখন সবাই করোনাভাইরাসের ভুক্তভোগী এবং তাদের পক্ষেও (যারা কাজ দিতেন) এর চেয়ে বেশি টাকা বা আগের মতো টাকা দেওয়া সম্ভব না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, গৃহিণী, বয়স ২৫, ক্যাম্প ১৪

> “আমি আগে যা আয় করতাম এখন তা অনেকটাই কমে গেছে। আমি এখন কম আয় করছি। করোনাভাইরাসের কারণে মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ নেই। আর আপনার সাথে যদি অন্যদের যোগাযোগই না থাকে, তাহলে আয় উপার্জনই বা কিভাবে হবে?”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ইমাম, বয়স ৩৮, ক্যাম্প ১৪

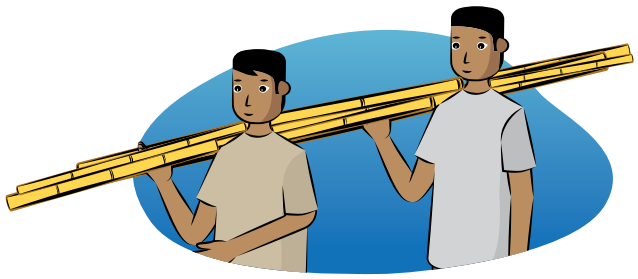

আর্থিক অনটন এবং মোকাবিলা করার পদ্ধতি (কোপিং মেকানিজম)

সকল অংশগ্রহণকারীই বলেছেন যে, হাতে নগদ টাকা না থাকায় ক্রমেই সমস্যা বাড়ছে এবং এগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে তাদেরকে নিত্য নতুন উপায়ের কথাও ভাবতে হচ্ছে। তাদের মতে, পড়াশোনার খরচের মতো বাড়তি কিছু খরচ মেটানোর জন্য নগদ অর্থ খুবই প্রয়োজন। নগদ অর্থের জন্য এমনকি মহামারীর আগেও কিছু পরিবার ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি করে দিতেন। আর বর্তমানে যখন কাজের সুযোগ কমে গেছে বা প্রায় নেই বললেই চলে, তখন আরও বেশি করে ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি করা ছাড়া কোনো উপায় নেই বলেই তারা মনে করেন। এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে বা বাড়তি খরচ মেটানোর জন্য আত্মীয় বা প্রতিবেশির কাছ থেকে টাকা ধার করার কথাও তারা বলেছেন।

> “ত্রাণ হিসেবে পাওয়া সব মসুর ডালই আমি বিক্রি করে দেই এবং এভাবে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা পাই। কিন্তু হাতে কোনো কাজ না থাকায়, এই টাকাও যথেষ্ট না। তাই আমাকে বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে ধারকর্জ করতেই হয়।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, কর্মহীন, বয়স ২৫, ক্যাম্প ১৪

> “প্রতিদিনের খরচ মেটানোর মতো পর্যাপ্ত টাকা আমার কাছে নেই। ত্রাণ সামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে আমি যে টাকা পাই সেটাই আমাকে প্রতিদিনের খরচ মেটাতে সাহায্য করে। তাই আমার কষ্ট হয় এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, কর্মহীন, বয়স ৬৩, ক্যাম্প ১৪

কাজের সুযোগ/নগদ আয়ের সুবিধা কমার পাশাপাশি, কোভিড-১৯ মহামারীর পর থেকে সরবরাহকৃত ত্রাণের পরিমাণও কমে গেছে বলে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকারদাতাদের কয়েকজন জানিয়েছেন, তারা চাল, ডাল, মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং তেল জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী আগের চেয়ে কম পরিমাণে পাচ্ছেন। ফলে মাছ, মাংস ও মশলার এখন এ ধরনের কিছু জিনিসও তাদের কিনতে হচ্ছে। সব অংশগ্রহণকারীরাই এ সম্পর্কে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে এসবের কারণে তাদের আগের তুলনায় কম খাবার খেতে হচ্ছে। এছাড়া কিছু অংশগ্রহণকারী খাবারের মান (যেমন: তাদেরকে দেওয়া শুকনো মাছ) নিয়েও অভিযোগ করেছেন। অন্যরা উল্লেখ করেছেন, তারা সাধারণত মসুরের ডাল বিক্রি করে দেন যা তাদের খাদ্য তালিকার অংশ নয়।

> “আমার পরিবারের জন্য এই অল্প পরিমাণ চাল এবং অন্যান্য সামগ্রী যথেষ্ট নয়। এছাড়া [আমার পরিবারে] কোনো উপার্জনকারী সদস্য না থাকায়, যে খাবার আছে তা দিয়ে সবার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করতে এখন কম কম খেতে হচ্ছে।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, গৃহিণী, বয়স ২৭, ক্যাম্প ১৪

> “অন্যান্য জিনিস কিনতে গেলে আমাদের কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি করতেই হয়। যেমন: শিশুরা শুকনো মাছ এবং ডিম খায় না বলে আমি এই জিনিসগুলো বিক্রি করে দিই।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, গৃহিণী, ৫০ বছর, ক্যাম্প ১৪

মহামারী চলাকালীন সময়ে কিছু অংশগ্রহণকারী নগদ অর্থের বিকল্প উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। একজন প্রবীণ নারী অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন, তার এতিম নাতি নিজের খরচ মেটানোর জন্য একটি এতিমখানা থেকে কিছু মাসিক বৃত্তি পায়। সে এই অর্থ এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পাওয়া অন্যান্য অর্থ পরিবারের জন্য খরচ করে। আরেকজন পুরুষ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন, তার স্ত্রী ঘরের পাশের পতিত জমিতে লাগানো পালং শাক এবং লাউ বিক্রি করেন।

রোহিঙ্গারা কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে আরও জানতে চায়

সূত্র: ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের বর্তমান চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে তাদের চাহিদা জানার জন্য ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মধ্য থেকে ৯ জন পুরুষ এবং ৯ জন নারীর টেলিফোনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকারগুলি ডিসেম্বর ২০২০-এর শুরুর দিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সংস্থা, এজেন্সি এবং কক্সবাজার কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গারা যেসব তথ্য জানতে চায় সেগুলো সরবরাহ করার ক্ষেত্রে দারুণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারপরেও, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেকেই কোভিড-১৯ সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানেন না। রোহিঙ্গাদের অনেকেই এখনো জানেন না কোথা থেকে কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা করাতে হবে, কিভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষায় যদি কারও শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় তাহলে কি হবে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভাইরাসটির বিস্তার রোধ করতে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা অপরিহার্য। পরীক্ষা করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত, সঙ্গনিরোধ/আইসোলেশন এবং চিকিৎসা করতে পারে, এভাবে জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঝুঁকি হ্রাস পায়। ক্যাম্পে বসবাসকারী ১৮ জন ব্যক্তির সাথে কথা বলে আমরা কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং ক্যাম্পে কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করি।

কোভিড-১৯ পরীক্ষা: খুব বেশি মানুষ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানে না

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ কোভিড-১৯ এর বিপদ সম্পর্কে অবগত এবং তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে যাতে তারা এ ভাইরাসে আক্রান্ত না হয়। তারপরেও পরীক্ষা করার ব্যাপারে সচেতনতা এবং সমাজে ভাইরাসটির বিস্তার রোধ করার ব্যাপারে সচেতনতা কম। কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করার সময়, অনেকেই একে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণের সাথে মিলিয়ে ফেলেন এবং মনে করেন যে পরীক্ষা অর্থ ডাক্তার কোভিড-১৯-এর উপসর্গ সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন সেগুলো। তারপরেও, যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই জানেন যে, যাদের জ্বর, কাশি বা মাথাব্যথার মতো উসপর্গ রয়েছে তাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। অনেকে শীতের সময় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অনেকে আবার উল্লেখ করেন যে, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত না হয়েও শীতকালে এই ধরণের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যাইহোক, এটা স্পষ্ট যে সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা বিষয়ে আরও নির্দিষ্ট তথ্য জানা প্রয়োজন।

যে ১৮ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে পাঁচজন কোভিড-১৯ পরীক্ষার কথা শুনেছেন কিন্তু তারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানেন না।

তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চান:

- রোগের উপসর্গ দেখা দিলে কোথায় যেতে হবে?
- ক্যাম্পের কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে পরীক্ষা করানো যায়?
- যাদের শরীরে করোনভাইরাস পাওয়া যাবে তাদের কি হবে?
- তাদের কতদিন কক্সবাজারে বা আইসোলেশন সেন্টারে থাকতে হবে?
- তাদের কি ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হবে?
- চিকিৎসা নিতে কত সময় লাগে?

কমিউনিটির অনেকেই কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতির কারণে পরীক্ষা করাতে ভয় পান। তাদের ভয় দূর করতে এবং মানুষকে পরীক্ষা করাতে উৎসাহিত করতে হলে তাদেরকে আরও তথ্য সরবরাহ করতে হবে যাতে তারা সজ্ঞানে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

> "ক্যাম্প ১২ তে আমার একজন আত্মীয় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করা যায় কারণ তার ঠাণ্ডা লাগা, জ্বর, মাথাব্যথা এবং গলাব্যথা হয়েছে। তার শরীরে করোনাভাইরাস আছে কি না পরীক্ষার জন্য তাকে আইওএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুইদিন পরে তার পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে এবং তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই রেখে দেওয়া হয়।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৩৫ বছর, ক্যাম্প ৯

> "আমি পরীক্ষা করা নিয়ে একটু চিন্তিত কারণ আমি শুনেছি যে যদি কারও জ্বর বা করোনাভাইরাসের অন্য কোনো লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে তাকে কক্সবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপরে বাড়ি ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যায়। আমি এটা নিয়ে খুব ভীত।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৩৫ বছর, ক্যাম্প ১২

> "আমি চাই এনজিওরা আমাদের ঠিকভাবে জানাবে যে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা করাতে বা চিকিৎসার জন্য আমাদের কোন কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে হবে।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৩২, ক্যাম্প ৩

> "আমি জানতে চাই যে কোথা থেকে পরীক্ষা করানো যায় এবং কেনো এনজিওগুলো আমাদের এ সম্পর্কে বলে না।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৩৫ বছর, ক্যাম্প ১২

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।